চিন্তন

বেদান্তবাণীর আলোকে শ্রীশ্রীমা

প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা

ভারতবর্ষে আত্মা ও পরমাত্মা শব্দদুটি অপরিচিত নয়। জেনে বা না জেনেই আমরা শব্দদুটি ব্যবহার করি। আমাদের সনাতন শাস্ত্র বেদ এবং বেদের সারভাগ বেদান্তে আত্মা ও পরমাত্মার কথা আছে, যা উপনিষদ নামে খ্যাত। এটি গ্রন্থমাত্র নয়, এখানে প্রাচীন ঋষিদের গভীর অনুভূতিগুলি মন্ত্ররূপে বিধৃত হয়েছে। ঋষিরা সেইসব মন্ত্রের রচয়িতা নন, দ্রষ্টামাত্র। মন্ত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হল, সেগুলির উচ্চারণ যেন এক সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় রাজ্যে মানবমনকে অগ্রসর করে দেয়। স্বামীজী বারবার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেছেন মুণ্ডকোপনিষদের গম্ভীরভাবদ্যোতক সেই কবিতা—

> ‘‘ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
> তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥’’ ২।২।১০

—সেখানে সূর্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র-তারাও নয়, এইসব বিদ্যুতও নয়—এই সামান্য অগ্নির কথা কী? তিনি প্রকাশিত থাকাতে তদনুযায়ী সবকিছু প্রকাশিত হচ্ছে—তাঁর প্রকাশে এইসব প্রকাশিত হচ্ছে।

এই নিগূঢ় অনুভূতি যাঁদের নিজস্ব ছিল তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিপরিচয়কে বড়ো করে তোলেননি। প্রতিটি মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষির নামমাত্র উল্লিখিত। ব্যক্তিনিরপেক্ষ অপূর্ব ভাবের আলোক বিকিরণ করে মন্ত্রগুলি যুগ যুগ ধরে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। উপনিষদের মন্ত্র উচ্চতম সত্যের প্রকাশ—সেখানে পরবর্তী কালের দার্শনিক বিচার এবং প্রচারের কোনও প্রয়াস নেই। নেই কোনও জটিলতা বা কুটিল ভাব। উপনিষদের ভাষা তীক্ষ্ণ ফলকের মতো হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। দেহ-মন-বুদ্ধির পারে যেখানে শুধু আত্মা ও পরমাত্মার প্রসঙ্গ সেখানে আলোকপাত করছেন উপনিষদ। সাধারণভাবে ভক্তির প্রসঙ্গ না থাকলেও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথা উপনিষদে আমরা দেখি। উপনিষদ যেন বিশ্বজগতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করছেন : ‘‘কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?’’ একবিজ্ঞানের দ্বারা সর্ববিজ্ঞান, বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধানই উপনিষদের বৈশিষ্ট্য। উপনিষদের প্রশ্নকর্তারাও গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে জানাচ্ছেন : ‘‘তদাত্মনি নিরতে উপনিষৎসু যে ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু’’—আমরা আত্মভাবনায় নিরত সুতরাং উপনিষদপ্রোক্ত সত্যকে জানবার অধিকার আমাদের আছে। সুতরাং যে-গুণ বা ধর্মগুলি আত্মজ্ঞানলাভে সহায়ক, সেগুলি আমাদের মধ্যে আসুক। স্বামীজীর ভাষায় : ‘‘বৈরাগ্যই উপনিষদের প্রাণ। বিচারজনিত প্রজ্ঞাই উপনিষদ্‌জ্ঞানের চরম লক্ষ্য।’’ উপনিষদের চিন্তায় কোনও দৈন্য, কোনও ক্ষুদ্রতা নেই। ঋষিরা স্থূল বস্তু থেকে সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম বস্তুর দিকে নিয়ে যান মানবাত্মাকে। সাধারণ মানবকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ থেকে উপনিষদ আহ্বান জানাচ্ছেন ভূমার সুখের দিকে—‘‘যো বৈ ভূমা তৎ

সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য...” (ছান্দোগ্য, ৭।২৪।২)। ওই ভূমাই দ্বিতীয়বিহীন সত্তা। যিনি ভূমা তিনিই অমৃত।

উপনিষদে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত-ভাবাত্মক মন্ত্র আছে—সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্ব বোঝাবার আগে উপনিষদ স্থূলতর ভাব এনেছেন এবং পরে সূক্ষ্মভাবে উপদেশ দিয়েছেন—শেষে দুইভাবই মিলে গেছে আত্মার মধ্যে—‘তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো’। শ্বেতকেতুকে তাঁর পিতা বটফল ভেঙে তার মধ্যে যে-বীজ এবং তারও যে-সূক্ষ্মাংশ, সেটি ইঙ্গিত করে বলছেন : বৎস, অতি সূক্ষ্ম অংশটি তো তুমি দেখছ না, কিন্তু সেখান থেকেই এই বটবৃক্ষের উৎপত্তি।—অর্থাৎ নামরূপহীন সূক্ষ্ম কারণ থেকেই নামরূপাত্মক স্থূলজগতের উৎপত্তি।

উপনিষদে আত্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ আছে, আছে সেটি লাভ করার সাধনের কথা, আত্মার দর্শনে মানুষের কী পরিবর্তন ঘটে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতে—সেসব কথাও আছে। কিন্তু নেই সেই মহাজীবন, যেখানে ব্যবহারিক জগতে সেই জ্ঞানের স্ফুরণ হয়েছে—উপনিষদের জ্ঞানের বিকিরণ ঘটিয়ে তা লোকগ্রাহ্য হয়েছে। শ্রীমা সারদা দেবীর জীবন উপনিষদের আলোকবর্ষী এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত—যাকে বলা যায় অধ্যাত্মজগতে এক অতিবিরল ‘phenomenon’।

শ্রীশ্রীমা উপনিষদ পড়েননি, হয়তো কোনওদিন চোখেও দেখেননি, কিন্তু দেখেছিলেন—‘অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্ত’ যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণকে। আমরা অবাক হয়ে দেখি, পাড়াগাঁয়ের ওই বধূটির অন্তর যেন মালিন্যমুক্ত উদার নীলাকাশ। কী সন্তোষ, আনন্দ ও তৃপ্তি নিয়ে তিনি নহবতের ওই ক্ষুদ্র কক্ষে দিন যাপন করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁকে বলছেন—‘সরস্বতী’—অর্থাৎ জ্ঞানের দেবী, জ্ঞানময়ী শুধু নন, জ্ঞানবিতরণকারিণী মহাশক্তি। এইপ্রসঙ্গে মনে পড়ছে স্বামী অসঙ্গানন্দ মহারাজের মুখে শোনা একটি ঘটনা। তখন পুরোনো দিনের বেলুড় মঠ, ঠাকুরের সন্তানেরা অনেকেই আছেন মঠ আলো করে। নবাগত ছেলেরা পড়াশোনা-জানা; মঠে তখন বাঁকে করে গঙ্গা থেকে প্রচুর জল তুলতে হত আবার মাঠে ঘাসের মধ্য থেকে আগাছা তুলে পরিষ্কারও করতে হত। একজন ব্রহ্মচারী বাঁকে করে জল এনে ক্লান্ত, তার চোখে পড়ে রাজা মহারাজ বসে বসে আলবোলায় তামাক খাচ্ছেন। সে মহারাজকে সরাসরি প্রশ্ন করে : ‘‘আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়ে দিতে পারেন?” মহারাজ তা শুনে প্রতিপ্রশ্ন করে ওঠেন : ‘‘তোর কি ধারণা, আমরা ঘাস কাটার জন্য মঠে আছি?” ব্রহ্মচারীর মুখে তখনও একই প্রশ্ন। এবার রাজা মহারাজ বলেন, ‘‘হ্যাঁ পারি, তবে আমাদের একটু কষ্ট করতে হবে। আর মা ঠাকরুন হাত বাড়িয়েই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।”

ঠাকুরকে বোঝার জন্য ছয় বছর যিনি সংগ্রাম করেছিলেন, তিলে তিলে নিজের সন্দেহ ভঞ্জন করে এগিয়েছিলেন, সেই স্বামীজী স্বামী শিবানন্দকে লিখলেন : ‘‘মা ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে।” যিনি সাক্ষাৎ বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং যাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, ‘‘ও কি যে সে, ও আমার শক্তি”, তাঁর শক্তির বিপুলতার পরিমাপ কে করবে? শ্রীমা যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী, অনন্ত অধ্যাত্মভাবের অধীশ্বরী—তা ক্রমে ক্রমে অনুভব করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মহাতাপস পার্ষদগণ। সাধারণ ভক্তদের কাছে তিনি স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী মা, যিনি সন্তানের মনপ্রাণ কেড়ে নিয়ে আপনার থেকেও আপনার করে নেন। সন্ন্যাসিসন্তান অনুভব করেছেন : ‘‘ইনি এমন মা যিনি সংসারে বাস করছেন, সন্তানকে সংসারের পারে নিয়ে যাবার জন্য।”

কাশীতে শ্রীমা তখন ছিলেন লক্ষ্মীনিবাসে। একদিন রাজা মহারাজ মায়ের কুশল সংবাদ নিতে এসেছেন। গোলাপ মা ওপর থেকে বললেন, ‘‘রাখাল, মা জিজ্ঞাসা করছেন আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?” মহারাজের সপ্রতিভ উত্তর, ‘‘মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি।” শ্রীমায়ের যে ব্রহ্মবিজ্ঞান হাতের মুঠোয় ছিল সেকথাটি সুস্পষ্ট করেছেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর অন্তরঙ্গপার্ষদগণ।

উপনিষদ আমাদের বহুযুগের সঞ্চিত অধ্যাত্ম জ্ঞানভাণ্ডার। সনাতন ভারতবর্ষের রীতি ছিল, কোনও ব্যক্তির অধ্যাত্ম-অনুভব পরখ করতে হলে দেখতে

হবে গুরুর নির্দেশ, শাস্ত্রবাক্য ও স্বানুভব—এই তিনটি মিলছে কি না। আমাদের বিদ্যা গুরুপরম্পরায় গ্রথিত। তাই গুরুর নির্দেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেই নির্দেশ আবার শাস্ত্রানুগ হবে এবং সাধকের অনুভবের সঙ্গে মিলবে। এখানে উপনিষদের অনন্য ভূমিকা। আচার্যেরা সবসময়ই শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করেন নিজেদের সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে অদ্বৈতানুভূতি এক অপূর্ব পর্যায়ে পৌঁছেছিল। সেখানে দেখি সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে তাঁর গভীর একাত্মতা। সবুজ ঘাসের ওপর কেউ হেঁটে গেলে তিনি বেদনার্ত হচ্ছেন, ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়াকে চাবুকের আঘাত করলে অথবা নৌকার মাঝিরা পরস্পর বিবাদ করে একে অপরকে আঘাত করলে, সে- আঘাত তাঁর শ্রীঅঙ্গে লাগছে। বালিশের খোলের মধ্যে যেমন বালিশ দেখা যায়, তেমনি মানুষের খোলের মধ্যে সচ্চিদানন্দকে তিনি দর্শন করছেন।

শ্রীমারও যে সর্বদাই অদ্বৈতানুভূতি হত সেকথা তিনি খুব কমই প্রকাশ করেছেন। নৈবেদ্য থেকে পিঁপড়েটাকে পর্যন্ত সরাতে গেলে যিনি ঠাকুরকে তার মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে নিরস্ত হতেন, তাঁর অকথিত, অলিখিত অনুভূতিগুলির ইয়ত্তা কে করবে! এমন অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিতা মায়ের পক্ষেই বলা সম্ভব : ''সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগদি ডোমের মাঝেও তিনি। তবে তো মনে দীন ভাব আসবে।''

শ্রীমার চারদিকের বাতাবরণ সবসময় অনুকূল ছিল না। তিনি আমাদের সকলের জন্য বহুসমস্যা-কণ্টকিত সংসারেই থেকেছেন। সেখানেও দেখি মা প্রতিরূপে সেই সচ্চিদানন্দকে দর্শন করে আত্মস্থা রয়েছেন—নচিকেতার মতো 'বিচাল্যমানোঽপি ন বিচচাল'। নচিকেতাকে প্রলুব্ধ করেছিলেন যমরাজ, আর মায়ের চারিদিকে তাঁকে উত্যক্ত ও বিচলিত করার জন্য ছিল এক বিচিত্র পরিবেশ—ভাইদের স্বার্থবুদ্ধি, অর্থলোলুপতা, ভাইঝিদের পরস্পরের প্রতি হিংসা-দ্বেষ, নলিনীদির শুচিবায়ু, রাধুর অদ্ভুত আবদার, ছোটোমামির পাগলামি—সব মিলিয়ে জয়রামবাটী এবং বাগবাজার—দুই স্থানেই ছিল অবর্ণনীয় আবহাওয়া। তারই মধ্যে মাকে দেখি ধীর-স্থির, অনন্ত ধৈর্যের প্রতিমা। তাঁর ওই স্থৈর্যের অন্তরালে কি ছিল সর্বভূতে আত্মবুদ্ধি? উপনিষদ যাকে বলছেন—

''অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥'' (কঠ, ২।২।৯)—অর্থাৎ একই অগ্নি পৃথিবীতে প্রবেশ করে দাহ্যবস্তু অনুযায়ী যেমন আকার ধারণ করে, সেইরকম অদ্বিতীয় সর্বান্তর্যামী আত্মা জীবদেহে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের অনুরূপই হন, অথচ তার দ্বারা অস্পৃষ্ট, অবিকৃত থাকেন।

শ্রীমার কাছে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রতীয়মান মানুষজনের মধ্যে এক, অভিন্ন পরমাত্মাই সত্য ছিল। মায়ের শুদ্ধ মনের গতিই শুধু ঊর্ধ্বগামী ছিল না, সে-মন ছিল তাঁরই ভাষায় 'নির্বাসনা'। এই বাসনামুক্ত মনের কথাই তো উপনিষদ বারবার ঘোষণা করেছেন—

''যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥''
(কঠ, ২।৩।১৪)

—মানবহৃদয়ে যত কামনা আশ্রিত আছে, তারা যখন বিশীর্ণ হয়, তখন মরণধর্মা মানুষ অমর হয়—এই দেহেই ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করে। নানা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা এই কামনা বা বাসনার কথা বলেছেন। ''বাসনাতেই দেহ হতে দেহান্তর হয়।... বাসনাটি সূক্ষ্ম বীজ—যেমন বিন্দু পরিমাণ বটবীজ হতে কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, তেমনই।'' ''বাসনা হতেই তো দেহ। একেবারে নির্বাসনা হল তো সব ফুরাল।''

শ্রীশ্রীমায়ের অনাড়ম্বর শান্ত জীবনযাত্রার মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে প্রবহমান ছিল বিশুদ্ধ জ্ঞানের নির্মলধারা। কখনও ব্যবহারিক জীবনে, কখনও বা পারমার্থিক বিষয়ে তার পরিচয় প্রকাশিত হত। দু-একটি বাক্যে বহু সমস্যার মীমাংসা তিনি করে দিতেন। একটি ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন সদ্য লীলাসংবরণ করেছেন। তাঁর দেহাবশেষ একটি মাটির কলসিতে করে কাশীপুরে এনে রেখেছেন স্বামী

রামকৃষ্ণানন্দ। ভক্ত রামবাবুর ইচ্ছা সেটি কাঁকুড়গাছির উদ্যানে স্থাপন করে পূজা করবেন। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল ঠাকুরের পবিত্র অস্থি গঙ্গাতীরে কোনও একটি স্থানে সংরক্ষণ করবেন। আর যাঁর অধিকার সকলের চেয়ে বেশি তিনি ছিলেন নীরব, এই বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে একান্ত উদাসীন। গোলাপ-মাকে প্রাণের কথা বললেন—''এমন সোনার মানুষই চলে গেলেন; দেখেছ গোলাপ, ছাই নিয়ে ঝগড়া করছে!''

উপনিষদ আমাদের বলেছেন, প্রয়াণের সময় প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে বিলীন হয়, শরীর হয় ভস্মীভূত, ওম্ শব্দের প্রতীক মনোময় অগ্নি তখন অতীতের কৃত কর্মসমূহকে স্মরণ করে—

''বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥''
(ঈশ, ১৭)

একবার কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, ''স্বামী বল, পুত্র বল, দেহ বল, সব মায়া। এইসব মায়ার বন্ধন কাটাতে না পারলে পার হওয়া যায় না। দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাকেও কাটাতে হবে। কিসের দেহ মা, দেড় সের ছাই বই তো নয়—তার আবার গরব কিসের?''

উপনিষদ এই পরম বৈরাগ্যের আলো। উপনিষদ তাই ঘোষণা করলেন :

''এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়ো আত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥
(কঠ, ১।৩।১২)

—সমস্ত জীবের মধ্যে গূঢ় অর্থাৎ অবিদ্যামায়ায় আচ্ছন্ন আত্মা প্রকাশিত হন না সকলের কাছে। একমাত্র একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিসহায়ে সূক্ষ্মদর্শিগণ তাঁকে প্রত্যক্ষ করেন।

শ্রীশ্রীমার সামান্য সামান্য মন্তব্য ওই একাগ্র সূক্ষ্ম বুদ্ধির ঝলক। নিত্যানিত্য এবং সদসদ্‌বিচারে তাঁর মন এমনই শুদ্ধ যে, তাঁর কথায় ব্যবহারিক বা পারমার্থিক ক্ষেত্রে, কোথাও কোনও অপসিদ্ধান্ত নেই। উপরন্তু বলা চলে, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুর এবারে যা বলেছেন তা বেদবেদান্তকেও ছাড়িয়ে গেছে।

উপনিষদ মানুষকে অবহিত করছেন গুরুগম্ভীর ভাষায় : ''ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি/ ন চেদিহাবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ।'' (কেন,২।৫)—জন্মমৃত্যুর চক্র অতিক্রম করতে হলে সেই পরম সত্যকে ইহজীবনেই জানতে হবে। যদি সেই আত্মার সন্ধান এ-জীবনে পাওয়া যায় তবেই জন্ম-জীবন সত্য, সফল হল, অন্যথায় ভোগের স্রোতে ভাসমান হলে 'মহতী বিনষ্টি' অর্থাৎ মুক্তি হবে না, কর্মবিপাকে পড়ে জগতে আসা-যাওয়াই সার হবে।

শ্রীশ্রীমা তাঁর অনন্য ভাষায় আশ্বাস দিচ্ছেন মরণশীল মানুষকে : ''কত সৌভাগ্যে এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজকর্মের মধ্যেও একটি সময় করে নিতে হয়।''

দুর্লভ মনুষ্যজন্মের কথা ওই ছোটো সংলাপেই জানিয়ে দিচ্ছেন। সাধক গানে গানে সেই কথাই জানাচ্ছেন :

''দুর্লভ কায়া জগমে পায়া।
দিন দিন দিন ন গাঁওয়াও।''

সেই মহাসৌভাগ্যের অধিকারী মানুষ। ঠাকুর বলছেন, ''মানুষ কি কম গা—অনন্তকে চিন্তা করতে পারে। অন্য জীবজন্তু পারে না।''

শ্রীমায়ের জীবনে নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি আমাদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয়। পূর্ব পূর্ব অবতারলীলায় আমরা দেখেছি, অবতারসঙ্গিনী অবতারের সত্তায়, চিন্তায়, প্রেমে চিরকাল একীভূত হয়ে থাকেন। রামময়জীবিতা সীতা কৃষ্ণপ্রেম-বিলাসিনী শ্রীরাধা। অথচ শ্রীমার পরমবৈরাগ্যের আগুনে দেখি এইসব সম্বন্ধই গৌণ হয়ে গেছে—তিনি যেন দেবীসূক্তের পরমা প্রকৃতি, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থা জ্ঞানবিগ্রহ।

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ দুরন্ত ক্যানসার রোগে শয্যাশায়ী। ডাক্তারেরা শেষ আশা ত্যাগ করেছেন, বিমর্ষ পার্ষদগণ মলিনমুখে আসন্ন কালের পদধ্বনি শুনছেন। এইসময় আশায় বুক বেঁধে শ্রীমা তারকেশ্বরে হত্যা দিতে চললেন কয়েকজন সঙ্গিনীকে নিয়ে। তারকেশ্বরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বেশ একটা যোগ ছিল। কামারপুকুর যাতায়াতের পথে তারকেশ্বরে তিনি মহাদেবকে দর্শন করতে যেতেন। দুঃখে-বিপদে, দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে মুক্তির জন্য মানুষ তখন

বাবা তারকনাথের শরণ নিত বিশ্বাসভরে এবং ওষুধও পেত। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বপ্ন দেখলেন : হাতি চলেছে ওষুধ আনতে। অর্থাৎ অমিতবলশালিনী অধ্যাত্মশক্তি চলেছেন এবার—কার সাধ্য বাধা দেয়? দুদিন নিরম্বু উপবাস করে তৃতীয় রাত্রির মধ্যমযামে শ্রীমার ধ্যানপ্রবণ একাগ্রচিত্তে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগল। ভবরোগের মহৌষধ পরম বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হল মন্দিরে। শ্রীমারই ভাষায় : ''কতকগুলো সাজানো হাঁড়ি ভাঙলে যে শব্দ ওঠে তেমনই''—এ যেন দ্বৈতদুঃস্বপ্নের নাশক রুদ্রের সেই প্রলয়কালীন বিষাণধ্বনি। 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'—এই চরম জ্ঞানের ভাব মায়ের সত্তাকে আচ্ছন্ন করল। তিনি উঠে চোখে-মুখে জল দিলেন। মায়ের জীবনীকার লিখছেন : ''শ্রীমায়ের সহসা মনে হল 'এ জগতে কে কার স্বামী? এ সংসারে কে কার? কার জন্যে আমি এখানে প্রাণহত্যা করতে বসেছি?' '' প্রসঙ্গত মনে পড়ে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ : ''ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।'' শ্রীমায়ের মন সর্বাবগাহী ব্রহ্মভাবে নিমগ্ন হয়েছিল। তাই জাগতিক অতিপ্রিয় সম্পর্ককে ছিন্ন করে তা আত্মভাবের দিকে ধাবিত হল। উপনিষদ সেই উত্তরণকে বর্ণনা করছেন :

''ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি, ন রোগং নেতি দুঃখতাম্।
সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যান্তি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ॥''

(ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২)

পশ্য অর্থাৎ যিনি সেই আত্মাকে আপন হৃদয়ে এবং বাইরে সর্বত্র অনুভব করেছেন তাঁর চিত্ত রোগ, মৃত্যু, দুঃখে আচ্ছন্ন হয় না। 'তরতি শোকমাত্মবিৎ'।

বাস্তবিক, ব্রহ্মবিজ্ঞানের আলো শ্রীমার জীবনে এমন সহজ মহিমায় প্রকাশিত হত যে, অনেকসময় তা মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করত। উপনিষদের 'অদ্বৈতভাব আঁচলে বেঁধেই শ্রীমার অদ্ভুত সংসারযাত্রা। জীবনের প্রথমদিকেই ঠাকুর তাঁকে পাঠ দিয়েছিলেন—মানুষ চামড়া, হাড় বা মজ্জা নয়। সেই জড়বস্তু অশুচি হয় না—মনই শুচি ও অশুচি। উপনিষদ জানাচ্ছেন—ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি 'অকামহত' অর্থাৎ তাঁর মন নির্বাসনা। তাঁর মনে আনন্দের অনাবিল ধারা বয়ে যায়। কিশোরী মা অজ্ঞাতসারেই সেই আনন্দ অনুভব করেছিলেন। তাঁর হৃদয়ে আনন্দের ঘট বসানো থাকত। সে-আনন্দকে জানলে—

''যতো বাচো নির্বর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥''

(তৈত্তিরীয়, ২।৯)

আরও জানাচ্ছেন উপনিষদ—''কিমহং পাপমকরবম্ ইতি, কিমহং সাধু নাকরবম্''—কেন আমি সৎকর্ম করিনি, কেন পাপকর্ম করেছিলাম, ইত্যাকার অনুতাপও জ্ঞানীর আসে না।

উপনিষদের ঋষি বলছেন—

''যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥''

(ঈশ, ৬)

—বাস্তবিক, শ্রীমায়ের লোকব্যবহারে প্রথম থেকেই চোখে পড়ে সমদৃষ্টি, অনন্ত সমবেদনা ও বিজুগুপ্সা বা ঘৃণার অভাব। সকলের প্রতি—দীন, দরিদ্র, আর্ত, সমাজে উপেক্ষিত, হীনচরিত্র সকলেই যেন তাঁর আপনার। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ নিষেধ করলেও একদা বিপথগামিনী সেই বৃদ্ধাকে তিনি বিমুখ করছেন না, তাঁর কাছে আমজাদ ও শরৎ উভয়েই সমান স্নেহের পাত্র। দাঁড়ের পোষা চন্দনা, গোয়ালের বাছুর, রাধুর বেড়াল—এদের প্রতিও তাঁর ভালোবাসা প্রসারিত।

তাঁর স্বকীয় সাধনার ধারা সম্বন্ধে আমরা অবহিত নই। স্বামী শিবানন্দ মহারাজ যে তাঁকে 'স্বয়ংসিদ্ধা' বলেছিলেন, শ্রীমা তাই-ই ছিলেন। কিন্তু তিনি একটি সাধনক্রম ও সিদ্ধির কথা বলেছেন : ''জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। 'মা,মা'—শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে দাঁড়ায়। এই তো সোজা কথাটা।''

শ্রীশ্রীমায়ের অপূর্ব বোধগুলি তাঁর গভীর সাধনারই দ্যোতক। আমরা ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটিই স্মরণ করছি—

''ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥''

—চৈতন্যসত্তার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, অর্থাৎ

পরিবর্তনশীল অনিত্য জগতের যা-কিছু—মন্ত্রের এই প্রথমাংশটি ধ্যানের বস্তু বা নিদিধ্যাসনের বিষয় বলেই নির্দেশ। দ্বিতীয়াংশ হল, তাহলে এই জগতের সঙ্গে ব্যবহার কী করে চলবে। এই আত্মভাবটি পালন করতে হবে ত্যাগের দ্বারা, সংসারের ধর্ম শোক-মোহাদিতে নির্লিপ্ত থেকে। মা গৃধঃ—কোনও আকাঙ্ক্ষা না করে। ঠাকুরের ভাষায় : ''কারুর কাছে চিৎহাত করবে না।'' পার্থিব ধনসম্পদ কেউ সঙ্গে আনে না—ধন কার? ধন কারও নয়। শ্রীমা বলতেন, ''ঠাকুর ভগবানের বিষয় ছাড়া কোন কথাই বলতেন না। আমাকে বলতেন, এই দেহ এই আছে, এই নাই, আবার সংসারে এসে কত দুঃখ, জ্বালা পায়।... এক ভগবানই নিত্য সত্য, তাঁকে ডাকতে পারলেই ভালো।'' দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নির্দেশে মা নিত্য ধ্যান করতেন। বলছেন, ''তখন কি মনই ছিল আমার। বৃন্দে (ঝি) একদিন আমার সামনে একটি কাঁসি গড়িয়ে দিলে, আমার বুকের মধ্যে যেন এসে লাগল।'' ধ্যানস্থা মায়ের বুকে সেদিন ওই শব্দ বজ্রের মতো লেগেছিল।

ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্র কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন। মনে হতে পারে, ধ্যানের পরই এই কর্মের নির্দেশ কেন দেওয়া হল? জীবনবিমুখী উপদেশে মানুষকে উপনিষদ কখনও বিভ্রান্ত করেননি। বলছেন, মানুষের জীবনের আয়ু অনুসারে বাঁচতে হবে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় হয়ে নয়, কামনাহীন কর্ম করে। সেই কর্ম নিন্দনীয় তো নয়ই, বরং কর্মের সাধনে মন ধীরে ধীরে কর্ম করেও নির্লিপ্ত থাকে।

''কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥''

—যদি বাঁচতেই হয় শত বৎসর কর্ম করেই বাঁচবার ইচ্ছা করবে। সেই কর্ম হল নিষ্কাম কর্ম, কর্মে জড়িয়ে পড়বে না। এ-মন্ত্রটি মায়ের জীবনে যেন এযুগে ব্যবহারিক বেদান্তের জীবন্ত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

বাস্তবিক শ্রীশ্রীমার মতো কর্ম করতে আমরা কোনও শক্তিকেই দেখিনি। মহা সত্ত্বগুণের অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিও জীবকল্যাণে নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গদেবের মতো ঘরে ঘরে হরিনাম বিলোতে পারেননি বলে দুঃখ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সেই লোককল্যাণব্রত নিজের ওপর নিয়ে কী অদ্ভুত ও আশ্চর্য কর্মই করে গেলেন। শ্রীমা একদিকে সন্ন্যাসিসন্তান অপর দিকে গৃহিসন্তানদের জন্য নিরলস কর্ম করেছেন। সেই কর্মের অন্তরালেও ছিল তাঁর অদ্বৈতানুভব—''কানাও তিনি, আবার খোঁড়াও তিনি।'' জীবে জীবে অধিষ্ঠিত আত্মাই দুঃখভোগ করছেন। তাঁর দৃষ্টিতে জীবচৈতন্য ও পরমাত্মা একীভূত। তাই শ্রীশ্রীমা বলেছেন, ''তাঁরই সৃষ্টি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। জীব কোন কষ্ট পাচ্ছে না—তিনিই পাচ্ছেন। তাই তো যে এসে কেঁদে পড়ে, তাকেই উদ্ধার করতে হয়।'' উপনিষদ বলছেন সেই পরমাত্মার জ্ঞানের ফলে—'মুখং শোভতেঽস্য'— মুখের দিব্য শোভা হয়। শ্রীশ্রীমা তাঁর সরল ভাষায় বললেন—''ভগবান লাভ করলে কি দুটো শিং বেরোয়? না, জ্ঞানচৈতন্য লাভ হয়।'' উপনিষদের সুরও ওই সুরে গিয়ে মিলছে—

''যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাঽস্মিন্
সংদেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ।
স বিশ্বকৃৎ স হি সর্বস্য কর্তা
তস্য লোকঃ স উ লোক এব॥''

(বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১৩)

—এই অনর্থবহুল ও বিষম দেহে প্রবিষ্ট আত্মাকে যিনি লাভ ও সাক্ষাৎ করেছেন, তিনি বিশ্বের কর্তা; কারণ তিনি সকলের কর্তা। সকলেই তাঁর আত্মা এবং তিনিই সকলের আত্মা।—আত্মাকে জানলে এইভাবেই জ্ঞান ও চৈতন্যলাভ করে সব মানুষ ধন্য হয়।✠